

কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(৯)

কিন্তু সব সময় সব কিছু ভুলে থাকাও যেমন যায় না , তেমনি যায় না ভাল থাকাও সব কিছু ভুলে-টুলে থেকে। স্মৃতির সরণীতে সারে সারে পড়ে থাকা স্মৃতিগুলো একে একে বের হয়ে আসে পেছনে ফেলে আসা সময়কে দু’হাতে ঠেলে । বিস্মৃতির অন্ধকারে অসংখ্যরা হারিয়ে গেলেও, যা কিছু অবশেষ থাকে - এক জীবনে তাই কী যথেষ্ট নয় ? তাই তো হারিয়ে যাওয়া কুঠুরি গড়িয়ে যা কিছু পাওয়া যায়, তা-ই হাঁপানির হাপড় টানার মতো মানুষ টানতে থাকে অবিরত । কাল থেকে কালে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে , পরস্পরা থেকে পরস্পরায় এই প্রবাহমানতা জীবনের বহমানতাকেই ঋদ্ধ করে। মানুষকে শেকড় ফিরিয়ে দেয় । মানুষকে শেকড়ে ফিরিয়ে নেয় । তাই তো বার বার আমরা ফিরে যেতে চাই মাটির কাছে- মায়ের কাছে । কেননা, মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার এই আকৃতি স্মৃতি হাতড়ে নাড়ির কাছে ফিরে যাবারই আকৃতি । তাই মনে হয় মা আর মাটি রূপী মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে এক স্মৃতির সুপারিসর বৃত্ত । আর আমরা সারাটি জীবন সেই বৃত্তের ভেতরই থোর বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোর করে বেড়াই । একেক বার মনে হয় প্রত্যেক মানুষ একই কথা বলে বেড়ায় সারা জীবনভর নানা কসরতে - নানা বাহানায়- নানা ভংগীতে । কে হায় হৃদয় খুঁড়ে সেই অসংখ্য স্মৃতি-কাকলীরই হয়তো পুনরাবৃত্তি ।

আমরা যে পথ দিয়ে স্কুলে যেতাম তা মাঠ শেষ হয়ে যখন গ্রামে উঠতো - সেখান থেকেই শুরু হতো জমিদার বাড়ির পুকুরের চালা । বিশাল আয়তনের পুকুরের পাড় ঘেষে আঁকা-বাঁকা পথ শেষ হলেই জমিদার বাড়ির পাঁচিল । ততদিনে জমিদারিতে যেমন পড়েছে শেষ বিহাগের রাগ- তেমনি জমিদার বাড়ির চার দেয়ালেও জমেছে শ্যাওলা । সংস্কারের অভাবে ভেংগে ভেংগে পড়ে গেছে দেয়ালের পিলার । খসে যেতে শুরু করেছে ইটের গাঁথুনি । আর সেই ধবসে যাওয়া ইট -সুড়কির উপর দিয়েই আগাছা জমে জমে তৈরি হয়েছে পায়ে চলার পথ। দেয়ালের চারদিকের এক সময়ের সেই পাহারা চৌকিগুলোর উপর থেকে ছাদ খসে পড়ে কঙ্কালসার কাঠামোগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিধি রাম সর্দারের মতো । প্রায় আধেক মাইল লম্বা সেই দেয়াল ছাড়ালেই জমিদার বাড়ির বিশাল ফটক । তার সামনে আবার বিশাল দিঘি । দিঘির এক পাড়ে মাঠ । যা শীতকালে সার্কাস আর যাত্রার জন্য বরাদ্দ থাকতো । অন্য পাড়ে বাজার । পুকুরের অন্য দিকে ঠিক জমিদার বাড়ির উলটো দিকে কলেজ প্রিন্সিপালের বাসভবন । তা ছাড়িয়ে কলেজ । কলেজের পাশ দিয়ে রাস্তা। সামনে আবার দিঘি । তার পর বিরাট খেলার মাঠ । মাঠ সংলগ্ন কয়েক একর জমি । আর তার পাশেই আমাদের স্কুল ।

রাস্তার এক দিকে প্রাইমারি । অন্য পাশেই হাই-স্কুল । বিজ্ঞান ক্লাসের জন্য তৈরি দালান । তা শুধু ব্যবহৃত হতো ল্যাবরেটরি হিসেবে । আর ক্লাস ঘর ইংরেজী ইউ আকৃতির । এক পাশ থেকে শুরু হতো ক্লাস সিক্স । তার পর ক্রমানুয়ে উপরের ক্লাস । অবশেষে দশম শ্রেণী শেষে সর্ব শেষ ঘর থেকে সোজা বেড়িয়ে যাওয়া । ক্লাসের সামনে ঠিক বাংলা স্টাইলে শিক্ষকদের বসার ঘর । একই কক্ষে সবাই বসতেন গোল টেবিলের চারপাশে । মাথার উপর তিনটে ছবি

ঝুলানো দেখেছি আশির দশকের মাঝ অবধি । মাঝখানে রবীন্দ্র নাথ । দুই পাশে বংগবন্ধু শেখ মুজিব আর কাজী নজরুল ইসলাম । । বাংলা আর বাংগালীর তিন অহঙ্কার । পাশেই গ্রন্থাগার। আর স্কুলের দক্ষিণ পাশ বরাবর অসংখ্য কৃষ্ণ চুঁড়া আর নারকেল গাছের সারি । অন্য পাশে সজি বাগান করার মত এক চিলতে জমি । তার পর ছাত্রদের হোস্টেল আর শিক্ষকদের বাস ভবন । সামনে বর্গাকৃতির পুকুর । পুকুর পাড় হলেই থানা সদর দেখা যায় এমনি মাইল তিনেক বিস্তৃত মাঠ । আর স্কুল সোজা চলে গেছে উঁচু সড়ক । ক্লাস রুমগুলো এমনি ভাবে অবস্থান করছে যে প্রায় সারা বছরই বিস্তৃত মাঠ থেকে বয়ে আসা বাতাস কেমন জুড়িয়ে দিতো আমাদের ।

জমিদার বাড়ির ফটক পাড় হোতে মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকাতাম বাড়ির ভেতর অবধি যতটুকু দেখা যায় । ভাংগা ফটক গলিয়ে যা দৃষ্টি সীমানায় আসতো -তাতে স্বচ্ছলতার কোন অবশেষ দেখা যেতো না । বরং ভাংগা চোড়া অবকাঠামো আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খড় আর আবর্জনার স্তূপ জমিদার বাড়ির দারিদ্রকেই প্রকট করে তুলতো । কিন্তু ততদিনেও দাঁড়িয়ে আছে জমিদারের বিশাল অট্টালিকা আর অসংখ্য দরজা-জানালা শোভিত অগুনিত কক্ষ । বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসগুলো থেকে মনের ভেতর যে ছবি আঁকা হয়ে গেছে সে মতোই কল্পনা করতাম প্রতিটি কক্ষের ভেতরকে । আর সেখান থেকে শুনতে পেতাম নর্তকী আর বাঁদীজীদের নৃত্য-গীত ।

এক বার মাকে বললাম আমার এই এলোমেলো ভাবনাগুলো । মা বিমুগ্ধতায় শুনে গেলেন তার স্বপ্নচারী ছেলের স্বপ্নাকাশে বিচরণ। মা কিছু বললেন না । দুদিন পর বন্ধুদের সাথে স্কুল শেষে ফিরছি প্রতি দিনের মতোই । জমিদার বাড়ির ফটক বরাবর আসতেই জমিদার বাড়ির দারোয়ান পথ আটকে দাঁড়ালো আমার । জমিদার গিল্লি আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে বলেছেন । একান্তরে পাক-বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা জমিদারের বিধবা পত্নী - এলাকার সবাইছোট বড় নিবিশেষে তাকে কত্ৰীর্মা বলেই ডাকেন । সেই কত্ৰী মাকে আমরা স্কুলের বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেখেছি প্রধান অতিথি হিসেবে । ছোট খাটো গড়নের ধব ধবে সাদা শাড়িতে মার্জিত এই বিধবা মহিলা-দেখে নিতান্তই পরশীলিতা আর কথাবার্তাতেও সংস্কৃতির নিকষ ছাপ । এক ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে এখনো সামলে যাচ্ছেন একদা বিপুল প্রতিপত্তিশালী জমিদারের শেষ সম্পদগুলো । বয়সে আমার মায়ের চেয়ে একটু বড় । তখন বেশি করে হলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে । ক্ষত্রিয়ের অকাল বিধবাদের কঠিন কঠোর নিয়মের নীচে চাপা পড়া ধবংসাবশেষের মতোই মনে হয়েছে তখন তাকে । কেমন এক হতাশা আর বেদনার ছায়া সারা মুখমন্ডলে ।

আমি বাধ্য ছেলের মতোই দারোয়ানের পেছন পেছন রওনা হ'লাম । উন্মুক্ত ফটকের ভেতর দিয়ে এই প্রথম পা রাখলাম জমিদার বাড়ির ভেতর । প্রবেশ মুখেই দেখি জমিদার পত্নী দাঁড়িয়ে । আমাকে দেখেই বললেন , “এসো ।”

আমি হতবিহবল হয়ে বলে উঠলাম , “বাড়ি ফিরতে যে রাত হয়ে যাবে ।”

কত্ৰীমা বললেন, “ থেকে যাবে আজ রাতে । ” পরক্ষণেই বললেন , “ ভয় নেই, তোমার বাবাকে খবর পাঠানো হয়েছে স্কুলে । তিনি ফেরার পথে তোমাকে সংগে করেই ফিরবেন ।”

আমার সামনে তখন ভগ্ন জমিদার বাড়ির স্মৃতিময় দালান । সামনে অসংখ্য কুঠুরি । বাঁজিদের নাচ-গানের কল্পিত সুর-ঝংকার । হয়তো বা খাজনা দিতে ব্যর্থ কোন দরিদ্র প্রজার পিঠে পেয়াদার চাবুকের শপাং শপাং শব্দ । জমিদার বাড়ির উঠোনে একাত্তরের তেইশে নভেম্বরে পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পেটলের আগুনে পুড়িয়ে মারা অসংখ্য মানুষের গন-শ্মশান । আর সেখান থেকে ধেয়ে আসা দাউ দাউ আগুন । আর সে আগুনের কুণ্ডলিতে মর্মান্তিক ভাবে পুড়ে মরা জমিদার সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ রায় চৌধুরি- এলাকার স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাই যার হাত দিয়ে, প্রিন্সিপাল আফতাব উদ্দিন আহমেদ- প্রচন্ড বামঘেষা শিক্ষাবিদ, আরও প্রায় কুঁড়ি-পঁচিশ জন নিহত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ।

শীতের বিকেল । হেলে পড়া সূর্য তখন জমিদার বাড়ির ভাংগা পাঁচিল গলিয়ে অনেক দিনের চুনকামহীন দালানের উপর আছড়ে পড়েছে । আর সূর্যের শেষ আলোতে আমিও বারান্দার এবড়োথেবড়ো মেঝেতে সাবধানে পা ফেলে প্রবেশ করছি জমিদার বাড়ির প্রায়াক্কার কুঠুরিতে ।

(চলবে)

।। ডিসেম্বর ২০ , ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ।।

sarkerbk@yahoo.com